"হাওর জঙ্গল মৈষের শিং

এই তিনে মৈমনসিং"

কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনে পঞ্চরত্ন ঢাকা থেকে যাত্রা করল ময়মনসিংহের উদ্দেশে। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট পর ট্রেনের ছন্দময় দুলুনিতে সমীর রেলগাড়ি নিয়ে ময়মনসিংহের প্রচলিত একটি লোকছন্দ মাথা নেড়েনেড়ে আওড়াতে লাগলো।

"ঝক্কর ঝক্কর ময়মনসিং

ঢাকা যাইতে কতদিন"

বলতে বলতে মুহূর্তেই ট্রেন ময়মনসিংহ পৌঁছে গেল। আকাশের খালার বাড়ি ময়মনসিংহ শহরে। খালামনি সবাইকে দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি থাকার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রাতে খাবারের পর ঘরোয়া আড্ডায় এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলো।

ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণা এই চারটি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এ অঞ্চলের রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য। ময়মনসিংহ গীতিকা, জারি-সারি, পালা, কিসসা-কাহিনি, উঠান বৈঠক, লোক সাহিত্যকর্ম, গীতবাদ্য, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি এই বিভাগের লোক সংস্কৃতির অন্যতম দিক। এই জনপদের নারীরা নকশি পিঠা, পাকন পিঠা, বিভিন্ন প্রকার হস্ত ও কারুশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত থাকে।

নকশিকাঁথা এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারুশিল্প। কথার ফাঁকে আকাশের খালা একটি নকশিকাঁথা সবাইকে দেখালেন। আকাশের খালার বিয়ের সময় বাবার বাড়ি থেকে দুটি নকশিকাঁথা দিয়েছিল। এটি এ অঞ্চলের রেওয়াজ। এই কাঁথা আকাশের নানী নিজেই বুনেছিলেন, সাথে প্রতিবেশী মহিলারা সাহায্য করেছিলো। খালা বলল তোমাদের কাল জামালপুরের একটি নকশিকাঁথার গ্রামে নিয়ে যাব। যেখানে তোমরা নকশিকাঁথা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

নকশিকাঁথা

পরের দিন ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে তারা জামালপুর পৌঁছাল। এখানে অনেক নারী শিল্পী কাঁথা সেলাই করছে। লাল জমিন, কালো জমিন, সাদা বা আরো কতো রকম জমিনে বাহারি সুতার কারুকাজ। অবনী বলল শুনেছিলাম পুরাতন শাড়ির পাড় থেকে সুতা তোলা হয়, কিন্তু দেখছিনা তো।

একজন কাঁথা শিল্পী উত্তর দেয়, ওসব সৌখিন গ্রামীণ নকশিকাঁথা সচরাচর খুঁজে পাবে না । সেসব সৌখিন কাঁথা সখের বশে অনেকদিন সময় নিয়ে সাধারণত নিজেদের জন্য তৈরি করতো। এখন তারা নতুন কাপড়ে, নতুন সুতায়, আধুনিক ডিজাইনে নকশিকাঁথা তৈরি করছে। সময়ও কম লাগছে। নকশিপল্লী থেকে তারা এর ইতিহাস, নির্মাণ কৌশল, নানা প্রকার নকশিকাঁথার কথা জানলো।

নকশিকাঁথার ধারা মূলত দু' রকমের যেমন- যশোর রীতি ও রাজশাহী রীতি। এছাড়াও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম ধারাও লক্ষণীয়।

নকশিকাঁথা সেলাই এ সুই এর একেকটি ফোঁড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুই একবার গেঁথে উপরে উঠানোকে এক একটি ফোঁড় বলে। নানা ধরনের নকশায় বিভিন্ন প্রকার ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। যেমন—রানিং ফোঁড়, ক্রস ফোঁড়, হেরিংবোন, তারা ফোঁড়, গুজরাটি, হেম ফোঁড়, যশোর সেলাই, চাটাই সেলাই, কাইত্যা সেলাই, রিফু সেলাই, শর সেলাই, সার্টিন সেলাই, ব্যাক সেলাই ইত্যাদি।

নকশিকাঁথায় রানিং সেলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। রানিং সেলাই দিয়ে কাঁথার মূল জমিনের পরতগুলো প্রথমে আটকিয়ে নেওয়া হয়। ফোঁড় দেওয়া এক একটি লাইনকে তাগা বলে। অনেকগুলো তাগা দিয়েই জমিন তৈরি করা হয়। এরপর নানান প্রকার ফোঁড় দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। রানিং ফোঁড়ের নকশাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। নকশিকাঁথার পাড়েও নানা প্রকার নকশা করা হয়, যা জমিনের নকশা থেকে আলাদা। যেমন- মালা পাড়, মই পাড়, গাট পাড়, চিকপাড়, নাকের দুল, মাছ পাড়, পাঁচ পাড়, শামুক পাড়, ঢেউ পাড়, বরফি পাড় ইত্যাদি।

শুধু গায়ে জড়িয়ে শীত নিবারণের জন্যই এই কাঁথা তৈরি করা হয় না। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাঁথার প্রচলন আছে। যেমন- সুজনি কাঁথা, লেপকাঁথা, রুমাল কাঁথা, ছাপা বা খোল, জায়নামাজ, আসন, দস্তরখানা, আরশিলতা, বটুয়া, বুগইল - পান সুপারি রাখার ছোট থলে বা খিচা, গাটারি - বই/কোরআনশরীফ ইত্যাদি পেঁচিয়ে রাখার ঝোলা বা মোড়ক, বস্তানি - তৈজসপত্র রাখার বড় গাটরি, থলিয়া - তসবি, জপের মালা ইত্যাদি রাখার জন্য। এইসব নকশিকাঁথায় আশেপাশে দেখা নানা বস্তু যেমন- গাছ- লতা পাতা, ফুল- ফল, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, সরতা, হাতপাখা, কাপ-প্লেট ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও জ্যামিতিক নকশা, বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভুজ, কলকা ইত্যাদির ব্যবহারও লক্ষ্যনীয়।

পঞ্চরত্ন জামালপুর নকশিপল্লীতে এসে লক্ষ করল এখানকার নকশিকাঁথা আকাশের খালার বাড়িতে দেখা প্রাচীন নকশিকাঁথা থেকে একটু আলাদা। কাপড়, ডিজাইন, সেলাই, প্যাটার্ন, রং সবকিছুতেই আধুনিকতার ছাপ। নকশিকাঁথায়ও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। এই কাঁথা সেলাই করতেও আগের মতো আর অতোটা সময় লাগে না। ব্যবসায়িক উৎকর্ষে এখানকার নকশিকাঁথা দেশের গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাদৃত। পঞ্চরত্ন নকশিকাঁথা শিল্পীদের থেকে কয়েক ধরনের সেলাই বা ফোঁড় শিখে নিয়ে তা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখল।

এই পাঠে আমরা কয়েকটি ফোঁড়ের নাম ও সেলাই পদ্ধতি সম্পর্কে জানব

১। রানিংফোঁড় ২। ক্রস ফোঁড় ৩। সাটিন ফোঁড় ৪। হেরিং বোন ৫। তারা ফোঁড় ৬। হেম ফোঁড় ৭। স্টেম ফোঁড় ৮। বখেয়া ফোঁড় ৯। লেজি ডেইজি, ইত্যাদি।

এসব ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে ছোটবড় নানা ধরনের সুই, চিকন মোটা অনেক রকম রঙিন সুতা, ফ্রেম ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

(উপকরণ এর ছবি)

বিভিন্নরকমের সুঁইসুতা ও উপকরণ

রানিং ফোঁড়

রানিং ফোঁড় সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত সেলাই পদ্ধতি। সুই পরপর তিন থেকে চারবার কাপড়ে গেঁথে বা ডুবিয়ে উপরে তোলা হয়। এরপর সুতাকে টেনে নিয়ে আবার একই ভাবে বারবার সেলাই করে রানিং ফোঁড় করা হয়।

ক্রস ফোঁড়

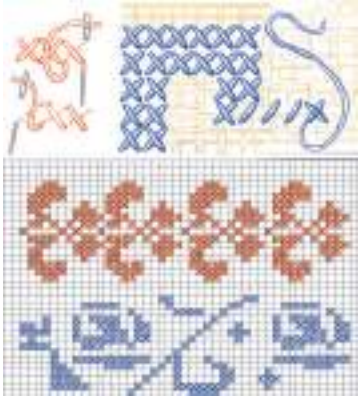

এই ফোঁড়ে করা চটের উপর নকশা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। অনেকটা গুণ বা ক্রস চিহ্ন এর মতই এই সেলাই। ক্রস ফোঁড়ের জন্য সাধারণত মোটা বুননের কাপড়, চট, সেলুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গ্রাফ করা ছকের মতো করে ক্রস ফোঁড়ের নকশা দেখতে জ্যামিতিক ডিজাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামদানি নকশাও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মত। তোমরা চিত্র দেখেই এই সেলাই আয়ত্ত করতে পারবে।

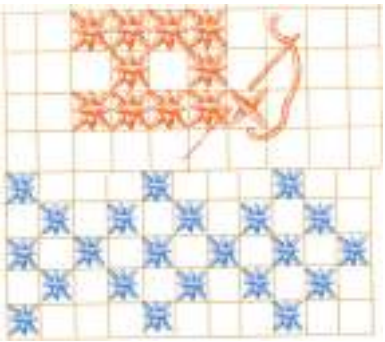

তারা ফোঁড়

তারা ফোঁড়ও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। সাধারণত চট, নেট বা সেলুলা কাপড়ে ক্রস ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। একটি ক্রস কোনাকুনি গুন চিহ্নের মতো ও তার উপর আরেকটি ক্রস যোগ চিহ্নের মতো দিলে ক্রস ফোঁড় হয়ে যাবে।

বখেয়া ফোঁড়

বখেয়া ফোঁড় তুলতে রানিং ফোঁড়ের মতো নিচ থেকে উপরে সুই চালিয়ে ফোঁড় তুলতে হয়। এই ফোঁড় দেখতে মেশিনের সেলাইর মতো । প্রথম ফোঁড় থেকে সামান্য পিছনে সুই গেঁথে আবার প্রথম ফোঁড়ের সামান্য সামনে সুই উঠিয়ে এর মুখটি আবার আগের ফোঁড়ের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে। এভাবে বারবার চলতে থাকলে বখেয়া ফোঁড় সেলাই হয়ে যাবে। জামা কাপড় শক্তভাবে জোড়া লাগাতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। নকশি কাঁথার নকশাসহ যেকোনো নকশা বখেয়া ফোঁড় দিয়ে করা যায়।

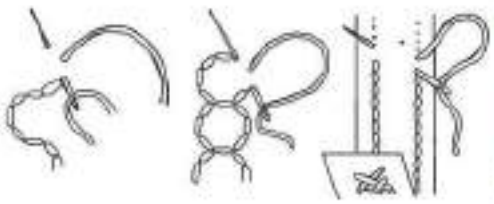

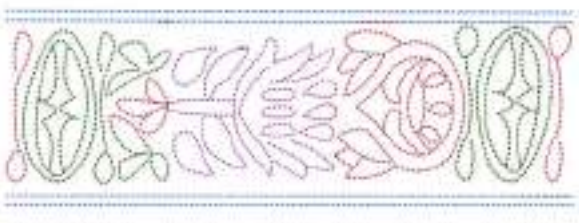

আমরা নানা প্রকার ফোঁড় সম্পর্কে জানলাম। যা আমরা ফিরে গিয়ে অনুশীলন করব। তারা এবার এসেছে নকশিকাঁথার বাজারে। জামালপুর শহরের প্রতিটি মহল্লায়, রাস্তার পাশে, মার্কেটে সর্বত্র কারুশিল্পের দোকান রয়েছে। এখানে নকশিকাঁথার সেলাই এ শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টু-পিস, থ্রি-পিস, পায়জামা, ব্যাগ নানা প্রকার শো-পিসসহ হাজারো রকমের পণ্য পাওয়া যায়।

নকশিকাঁথার সেলাইয়ের ফোঁড় এবং মোটিফগুলো দেখে অবনীর মাথায় নতুন ভাবনা এলো, সে বলল ফিরে গিয়ে আমরাও নকশিকাঁথার এই সব ফোঁড় ব্যবহার করে নতুন নকশা তৈরি করতে পারি। আগুন বলল তোমরা না হয় খুব সহজে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে নকশা তৈরি করতে পারবে। কিন্তু আমিতো সেলাই ভাল জানিনা, তাহলে আমি কিভাবে নকশা করব? অবনী বলল আমরা যারা সেলাই করতে পারব তারা ছোট একটা নকশা ইচ্ছে মত সুঁই সুতার ফোঁড় দিয়ে কাপড়ে করব। আর যারা সুঁই সুতার ফোঁড় দিয়ে কাপড়ে করতে পারবেনা তারা বিভিন্ন রঙের কলম দিয়ে আথবা পোস্টার রং দিয়ে কাগজে করবে।

এই পাঠে আমারা জানব কিভাবে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো নকশা তৈরি করা যায়

- প্রথমে প্রাকৃতিক আকৃতি—ফুল, লতা, পাতা অথবা জ্যামিতিক আকৃতি—ত্রিভূজ, বৃত্ত ইত্যাদি থেকে নিজের পছন্দমতো আকৃতি নিয়ে একটা মোটিফ তৈরি করব।
- মোটিফটির মাপ হবে দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি এবং প্রস্থ দেড় ইঞ্চি
- এবার কাগজে দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে নিব।
- বর্গক্ষেত্রটিকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করে নিব।
- মোটিফটি বর্গক্ষেত্রের চারটি ভাগে সমান ভাবে এঁকে নিব।
- এবার মোটিফগুলো সেলাইয়ের রানিং ফোঁড়ের মতো করে বিভিন্ন রঙের কলম অথবা পোস্টার রং তুলি দিয়ে ভরাট করব। এভাবে সম্পূর্ণ নকশাটি রং করা শেষ করব।
- একই ভাবে নকশা সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে আমরা কাপড়ের উপরেও ফুটিয়ে তুলব।

অবনীর এই পরিকল্পনা শুনে আগুন বলল বাহ! বেশ সুন্দর আইডিয়াতো। এভাবে আমরা খুব সহজে নতুন নতুন পন্যের নকশা করতে পারি। যেমন- উপহার কার্ড, উপহার সামগ্রীর বাক্স, ফটোফ্রেম, কলমদানী ইত্যাদি। এইভাবে নকশিকাঁথার শৈলিকে আমরা নানা মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি। সাথে সাথে আমাদের ঐতিহ্য নকশিকাঁথাকে আরো বেশি করে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । তাহলে বিশ্বের মানুষ জানবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী এক একটি নকশিকাঁথা যেন এক একটি গল্পের মাঠ। সুঁই সুতার নিপুন শৈলিতে বাংলার মেয়েরা বা বধূরা সে সুখ দুঃখের গল্প রচনা করছে । আমাদের পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর অমর সৃষ্টি “নকশী কাঁথার মাঠ”-এ সে সুখ দুঃখের গল্পকে দিয়েছে এক কাব্যিক রূপ।

এবার আমরা এক নৃত্যশিল্পীর কথা জানব যিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতা দিয়ে পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম রচনা “নকশী কাঁথার মাঠ” কে দিয়েছে এক অনবদ্য নৃত্যরূপ।

গাজী আলিমদ্দিন মান্নান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১ সনের ৮ ই জুন কুমিল্লার সাতকলা গ্রামে। বাংলাদেশের নৃত্য জগতে তাঁর অবদান অসামান্য। নৃত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহের ফলে তিনি নৃত্য শেখার জন্য শান্তিবর্ধনের আহ্বানে দেশ ছেড়ে বোম্বে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি লিটল ব্যালে ছাত্র হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। এরপর তিনি ১৯৫৫ সালে চীনে পাড়ি জমান এবং সেখানে তিনি অ্যাক্রবেটিক ডান্স, আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি দেশে ফিরে ১৯৫৮ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে 'নিক্কন ললিতকলা একাডেমী' নামে নিজের নৃত্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতীয় পারফর্মিং আর্টস এবং ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যপরিচালক হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করেন।

১৯৬১ সালে প্রথম পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম রচনা "নকশীকাঁথার মাঠ" কে এক অনবদ্য নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন গাজী আলিমদ্দিন মান্নান।

সেদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের হলের আলো জ্বলে উঠল। সমস্ত হল জুড়ে নিস্তব্ধতা। সুরের মূর্ছনার রেশ এখনও কাটেনি। দর্শকসারির সামনে বসে আছেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। তাঁর কল্পতরু যেন বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। মঞ্চের কালো পর্দা সরে গেল। রূপাই-সাজু সহ একে একে সকল কলাকুশলী মঞ্চে এসে উপস্থিত হল। সাথে সাথে সজোড় হাততালিতে হলঘরের নিস্তব্ধতা নিমেষেই ভেঙে গেল। অভিভূত কবি মঞ্চে উঠে রূপাইকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন নকশীকাঁথা মাঠের রূপাইয়ের

ভূমিকায় ছিলেন গাজী আলিমদ্দিন মান্নান ওরফে জি এ মান্নান। তারই পরিচালনায় ও নির্দেশনায় নকশীকাঁথা মাঠের নৃত্যের মাধ্যমে কাহিনি বিন্যাসের অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে যা এর আগে কেউ দেখেনি। নকশীকাঁথার মাঠ একধরনের ব্যালাড অর্থাৎ লোকগাঁথার বিশুদ্ধ সুর ও ছন্দসমন্বিত রূপ। আর বাংলার লোককাব্য নকশীকাঁথার মাঠকে পাশ্চাত্যের ব্যালে (পশ্চিমী নৃত্যনাট্য) নৃত্যের আঙ্গিকে, বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান মিশিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন জি এ মান্নান। নকশীকাঁথার মাঠ নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ খাদেম খান। আর শিল্পনির্দেশনা দিয়েছেন পটুয়া কামরুল হাসান।

তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নৃত্যসমূহ—নকশীকাঁথার মাঠ, ক্ষুধিত পাষাণ, মহুয়া, কাশ্মিরী, অধিক খাদ্য ফলাও, হাজার তারের বীণা, আলীবাবা চল্লিশ চোর, নবান্ন ইত্যাদি। ১৯৯২ সালের ১ মার্চ জি এ মান্নানের জীবনাবসান ঘটে।

সেদিন রাতের খাবারের পর সবাই মিলে গল্প করতে বসেছে। আগুন খালার কাছে ময়মনসিংহের জনপ্রিয় খাবারগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে খালা বললেন- ময়মনসিংহ অঞ্চলের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মুক্তাগাছার মন্ডা, শেরপুরের ছানার পায়েশ, নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি ও জামালপুরের ছানার পোলাও প্রসিদ্ধ ।

গল্পের মাঝে খালু এসে তাদের সাথে যোগদিল। ময়মনসিংহের লোক-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এক ফাঁকে খালু বললেন- বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ চিরদিনই সহজ সরল জীবন যাপনেই অভ্যস্ত। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের একটি জনপ্রিয় লোক সংস্কৃতি হল পালাগান।

পালাগান

পালাগান হলো লৌকিক আখ্যানমূলক গীত কীর্তন। পৌরাণিক কাহিনি, ধর্ম সংগীত, দেবদেবীর গুণ কীর্তন পালাগানের মূল বিষয় ছিল। যেমন—নিমাই সন্ন্যাস, নৌকা বিলাস। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পালা গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক ঘটনা, মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা, ব্যক্তিগত

ও লৌকিক ঘটনা ইত্যাদি নিয়েও পালাগান রচিত হয় ।

যেমন মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা। দিনের বেলায় পরিবেশন করা পালাগানকে দিবাপালা ও রাতে পরিবেশিত পালাকে নিশিপালা বলে।

পালাগানে দীর্ঘ গানের পাশাপাশি কিছু শ্লোক ও কথা থাকে। যিনি পালা রচনা করেন তাকে পদকর্তা বা অধিকারী বলা হয়। একজন গায়ক বা গায়েন পালা গান পরিবেশনার মূল ভূমিকায় থাকেন। তাকে বয়াতিও বলা হয়। বয়াতিকে সহযোগিতা করার জন্য চার পাঁচজন দোহার থাকেন। তারা ঢাক-ঢোল, করতাল, হারমোনিয়ামসহ কথোপকথনে অংশ নিয়ে সহযোগিতা করে।

পালাগানের গল্পে নায়ক, নায়িকা, পার্শ্ব-চরিত্র, পশুপাখি, সবই থাকে। বয়াতি সকল চরিত্রকে একাই সূর ও অংগভঙ্গীর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। বয়াতির চুল থাকে লম্বা, হাতে একখণ্ড রুমাল, কোমরে গামছা বা ওড়না বাঁধা থাকে। পরনে থাকে বর্নিল ঘাগড়া। কখনও ওড়না মাথায় দিয়ে মেয়ে চরিত্রও বয়াতি একাই প্রদর্শন করে। বয়াতি বন্দনা গীতি দিয়ে পালা শুরু করে। যেমন–

পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর।
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।।
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজজি করে চান্দ সদাগর।।
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাশ পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথথর
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।
চাইর কুনা পিরথিমী গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।
সুন্দরবন মোকামে বান্দলাম গাজী জিন্দাপীর
আসমানে জমিনে বান্দলাম চান্দে আর সুরুয।
আল্লার কালাম বান্দলাম কিতাব আর কুরান।।
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনতি।।

এই বন্দনার পর মূল পালাগান শুরু হয়। গ্রামের নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা গভীর আগ্রহে পালাগান উপভোগ করেন। এসব কাহিনির সাবলীল বর্ননা, গ্রামীণ-জীবন ও বাস্তবতা নির্ভর রচনা এসব পালার মূল আকর্ষণ। ‘দেওয়ানা মদিনা’ পালার রচয়িতা ছিলেন মনসুর বয়াতী, ‘ছুরত জামাল’ এর রচয়িতা ফকির ফৈজু, ‘কেনারামের পালা’র রচয়িতা চন্দ্রাবতী। এইসব পালাকারের রচিত পালা আমাদের লোক-সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন।

পঞ্চরত্নের এবার ময়মনসিংহের স্থাপত্য পুরাকীর্তি দেখার পালা। প্রথমেই তারা গেল শশী লজে।

শশী লজ

মুক্তাগাছার জমিদার বংশের উত্তরসূরি মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদের প্রবেশ মুখে রয়েছে গ্রিক-ব্রিটিশ মিশ্র স্থাপত্যধারায় নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও ১৬টি স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রবেশ তোরণ। তোরণের নিচের ৮টি স্তম্ভ ডোরিক কলাম ও উপরের ৮টি করিন্থিয়ান কলামের সমাহারে করা। প্রাসাদের দিকে যেতে চোখে পড়ে সবুজ ঘাসের উপর চমৎকার বাগান। তার মাঝখানে অলংকৃত মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি ঝরনার মধ্যে রয়েছে গ্রিক সৌন্দর্য দেবী ভেনাসের ভাস্কর্য। মূল ভবনের সম্মুখভাগের চূড়ায় ব্রিটিশ স্থাপত্যরীতিতে করা ত্রিভুজ আকৃতির পেডিমেন্ট। প্রধান তোরণ ও মূল ভবনেও ডোরিকি-করিন্থিয়ান মিশ্রণ

কলাম লক্ষণীয়। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কাঠের মেঝের বলরুম, সাজসজ্জার ঝাড়বাতি। দরজা, জানালায় রয়েছে রঙিন কাঁচের চমৎকার অলংকরণ।

এবার শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা দেখার পালা।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাত ধরে। তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অগ্রগামী শিল্পী। শিল্পীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র

নদীর তীরে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগ্রহশালায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনেক শিল্পকর্ম রয়েছে। তাছাড়া শিল্পীর ব্যবহার করা ইজেল, খাট, কাপড়-চোপড়, তুলিসহ নানা রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী রয়েছে এখানে। সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে এখানে শিশুদের জন্য একটি আর্ট

স্কুল পরিচালিত হয়। সপ্তাহে দুইদিন শিশু শিল্পীদের আনাগোনায় মুখরিত থাকে এ স্কুল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবিগুলো সামনা সামনি দেখতে পেয়ে পঞ্চরত্ন অভিভূত হয়ে গেল।

বিজয়'৭১

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য বিজয়'৭১ দেখার জন্য তারা সবাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্মরনীয় করে রাখতে নির্মিত হয়েছে বিজয়'৭১ স্মারক ভাস্কর্যটি ।

ভাস্কর্যে একজন কৃষক, একজন নারী ও একজন ছাত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যায়ী ভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কৃষক বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দিনগুলো স্মরণ করে তেজোদীপ্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। একজন সংগ্রামী নারী রাইফেল হাতে দৃঢ় চিত্তে আহবান করছে।

ভাস্কর্যের মূল বেদীর দেয়াল জুড়ে আছে পোড়ামাটিতে (টেরাকোটা) খোদাই করা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত নানান ঘটনাবলী। ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছে শিল্পী শ্যামল চৌধুরী। শিক্ষার্থী, দর্শনার্থীসহ নতুন প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেম ও ঐক্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে ভাস্কর্যটি ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের ভাস্কর্য বিজয়'৭১ দেখার পর তারা পাশেই ব্রহ্মপুত্র তীরে গেল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবি আঁকার প্রিয় জায়গা হলো এই ব্রহ্মপুত্র তীর। নদীতে রঙিন পালতোলা নৌকাসহ প্রাকৃতিক

দৃশ্য দেখে পঞ্চরত্ন অভিভূত। আকাশ গভীর মনোযোগ দিয়ে সে দৃশ্য পেনসিলে স্কেচ করে নিল। এই সময় সে বলল এইসব স্কেচগুলো ফিরে গিয়ে জলরঙে আঁকার অনুশীলন করব, যাতে আমিও একদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মতো জলরঙে দক্ষতা অর্জন করতে পারি।

আগুন, আকাশ ও ইরা পুরাকীর্তি দেখার সময় প্রাসাদের দেয়ালে, দরজা, জানালায় ও কলামে যে সমস্ত নকশা দেখেছে সেগুলো বন্ধুখাতায় এঁকে রেখেছে।

এবার তাদের যাত্রার গন্তব্য হলো চা'য়ের দেশ সিলেট। ময়মনসিংহকে বিদায় জানিয়ে তারা সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে মোটিফ তৈরি করে তা দিয়ে নকশা তৈরি করব। সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো করে নকশায় নানা রঙের কলম অথবা পোস্টার রং দিয়ে রং করব। সম্ভব হলে কাপড়ে সুঁই সুতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তুলব।
- এই অধ্যায়ে দেওয়া নকশীকাঁথা সেলাইয়ের বিভিন্ন ফোঁড়গুলো অনুশীলন করব।
- বইয়ে দেওয়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জলরং এ আঁকা নদী ও নৌকা অনুসরণে ইচ্ছামত নদী-নৌকার ছবি আঁকব।
- পালাগান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সাথে সাথে নিজেদের আশেপাশে কোন পালাগানের শিল্পী যদি থাকে তাহলে তাঁর সাক্ষাৎকার নিব এবং শিল্পীর অনুমতি সাপেক্ষে তা মোবাইল ফোনে ধারন করব এবং তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- গাজী আলিমদ্দিন মান্নান এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।